Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.26-34
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ষড্‌দর্শনসমুচ্চয়ে জৈন দর্শন: একটি পর্যালোচনা

সুদীপ্ত মন্ডল

গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা , ভারত

Abstract:

In Saddarsanasamuchchaya , Sri Haribhadrasuri discussed five other philosophies besides Jainism. In the context of Jain philosophy discussion, Haribhadrasuri said 'Subicharaban', means that in Jain philosophy there is a special space for judgement and debate; here the role of faith is secondary. There are two types of Jains – Svetambaras and Digambaras. A critical study of Jain philosophy in Saddarsanasamuchchaya is the topic of the paper discussed.

Keywords: Jain, Saddarsanasamuchchaya, Haribhadrasuri, Naba Tatwa (Nine theory), Samyak Darshan (Right Perception), Samyak Gyan (Right Knowledge), Samyak Charitra (Right Conduct).

ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করলে দেখা যায় দর্শনগুলির বিকাশ ঘটেছে সম্প্রদায়গতভাবে। ভারতীয় দর্শনে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য ও টীকা জাতীয় গ্রন্থ যেমন আছে তেমনি স্বতন্ত্র গ্রন্থও যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু স্পষ্টতই দেখা যায় টীকাকাররা বা গ্রন্থকাররা প্রত্যেকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সমর্থক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রতিভাবান দার্শনিকদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাঁরা নিজস্ব বিশেষ সম্প্রদায়কে অবলম্বন করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। পূর্বপক্ষরূপে অন্য সম্প্রদায়গুলির মতবাদ আলোচিত হলেও সেগুলির স্বতন্ত্র মর্যাদা ঠিক নেই। প্রত্যেকটি গ্রন্থই এককেটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলে চিহ্নিত হয়। তবে একই গ্রন্থে একত্রে সংক্ষেপে অনেক দর্শনের পরিচয় উপস্থাপিত করে কোন সংকলনজাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়নি, এ-কথাও ঠিক নয়। বিভিন্ন দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি সংগ্রহ করে সংক্ষিপ্ত আকারে সেগুলির বিবরণ দিয়ে রচিত কয়েকটি গ্রন্থ আমরা অবশ্যই পাই। এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত এবং বহুপঠিত গ্রন্থটি হল মাধবাচার্য রচিত সর্বদর্শনসংগ্রহ। এছাড়াও গুরুত্বের বিচারে উল্লেখযোগ্য অপর গ্রন্থটি হল হরিভদ্রসূরি রচিত ষড্‌দর্শনসমুচ্চয়।

হরিভদ্রসূরি ছিলেন জৈন। হরিভদ্রসূরি প্রাচীনতর, তার সময় মোটামুটি ষষ্ঠ শতক। হরিভদ্রের গ্রন্থটিতে রয়েছে মোট ৮৭ টি কারিকা। এই কারিকাগুলির কারিকাগুলির মধ্যে অত্যন্ত সংক্ষেপে বিভিন্ন দর্শনের তত্ত্ব উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

'ষড্‌দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে তিনি বলেছেন -

"সদ্দর্শনং জিনং নত্বা বীরং স্যাদ্বাদদেশকম্।

সর্বদর্শনবাচ্যো'র্থঃ সংক্ষেপেণ নিগদ্যতে।।”[১]

অর্থাৎ সৎদর্শন, জিন এবং স্যাদ্বাদের উপদেষ্টা মহাবীরকে নমস্কার করে সকল দর্শনের বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে কথিত হচ্ছে।

হরিভদ্রের গ্রন্থে উপস্থাপনা অত্যন্ত সরল এবং সর্বপ্রকার জটিলতা থেকে মুক্ত বলা চলে। গ্রন্থকারের মতে দর্শন বলতে শুধুমাত্র ছয়টি সম্প্রদায়কেই বুঝতে হবে এবং এই সংখ্যাটিকে যেন কোন প্রকারেই অন্যথা করা যাবে না। অর্থাৎ ছয়ের অধিক দর্শন যেন সম্ভবই নয়। দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি হওয়ার মূল হল দেবতার ভেদ এবং তত্ত্ব অর্থাৎ মূল সিদ্ধান্তের ভেদ। ছয় সংখ্যাটির ওপর একান্ত গুরুত্ব স্থাপন করলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু মোট সাতটি দর্শন আলোচিত হয়েছে। এ বিষয়ে গ্রন্থকার নিজেই যুক্তিটি উল্লেখ করেছেন। প্রথমে ন্যায়মত ও বৈশেষিক মত তিনি পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু পরে তিনি বলেছেন, অনেকে মনে করেন ন্যায় ও বৈশেষিককে পৃথক সম্প্রদায়ের মর্যাদা দেবার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ঐ দুটিকে একটি দর্শনরূপেই গণ্য করা যায়। কিন্তু তাহলে দর্শনের সংখ্যা পাঁচটি হয়ে যায়, ছয়টি থাকে না। এজন্য সবশেষে ছয় সংখ্যা পূরণের জন্য আটটি কারিকায় চার্বাকমত আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় কারিকায় হরিভদ্রসূরি বলেছেন –

“দর্শনানি যডেবাত্র মূলভেদব্যপেক্ষয়া।
দেবতাতত্ত্বভেদেন জ্ঞাতব্যানি মনীষিভিঃ।।”[২]

অর্থাৎ মূল প্রভেদ অনুসারে এখানে কেবল ছয়টি দর্শনকেই (বুঝতে হবে)। দেবতা ও তত্ত্বের ভেদে ছয়টি দর্শন মনীষীদের জ্ঞাতব্য।

মূল কারিকাগুলিতে অত্যন্ত সাধারণভাবে বিভিন্ন দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি শুধু বলা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থটির অন্তত দুটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ টীকা রয়েছে। একটি হল মণিভদ্র রচিত ‘লঘুবৃত্তি’ এবং অন্যটি হল গুণরত্ন রচিত ‘তর্করহস্যদীপিকা’।

হরিভদ্রসূরিকে ‘লঘুবৃত্তি’ টীকায় মণিভদ্র ‘শ্রীজিনশাসনপ্রভাবনাবিভাবকপ্রভোদয়ভূরিয়শ’ এবং ‘তর্করহস্যদীপিকা’ টীকায় গুনরত্ন ‘শ্রীজিনশাসনপ্রভাবনাপ্রভাতাবির্ভাবনভাস্করঃ’ উপাধিতে অলংকৃত করেছেন।

হরিভদ্রসূরি মহাশয় জৈন দর্শনের আলোচনার আরম্ভে বলেছেন –

“জৈনদর্শনসংক্ষেপঃ কথ্যতে সুবিচারবান্।”[৩]

অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে বিচার করে সংক্ষেপে জৈনদর্শন আলোচনা করা হচ্ছে।

টীকাকাররা ‘সুবিচারবান্’ পদটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে একমাত্র জৈন দর্শনেই বিচার-বিতর্কের বিশেষ অবকাশ আছে, এখানে বিশ্বাসের ভূমিকা গৌণ ।

টীকাকার মণিভদ্র বলেছেন – “সুবিচারবানিতি সাভিপ্রায়ং পদম্। অপরদর্শনানি হি ‘পুরাণং মানবো ধর্ম: সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ।।’ ইত্যাদ্যুক্ত্যা ন বিচারপদবীমাদ্রিয়ন্তে।

যুক্তিযুক্তবিচারপরম্পরাপরিচয়পথপথিকত্বেন জৈনো যুক্তিমার্গমেবাবগাহতে, ন চ পারম্পর্যাদিপক্ষপাতেন যুক্তিমুল্লঙ্ঘয়তি উক্তং চ-

পক্ষপাতো ন মে বীরে ন দ্বেষঃ কপিলাদিষু।
যুক্তিমদ্বচনং যস্য তস্য কার্যঃ পরিগ্রহঃ।।"

জৈনরা দুই প্রকার শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বরদের পরিচায়ক হল 'মুখবস্ত্রিকালোচাদির্লিঙ্গং চোলপট্টাদিকো বেষঃ।' এদের আচারের মধ্যে রয়েছে পাঁচটি সমিতি ও তিনটি গুপ্তি। মাধুকরী বৃত্তিতে আহার সংগ্রহ করে এরা। দিগম্বররা হল 'নাগ্ন্যলিঙ্গাঃ পাণিপাত্রাশ্চ'। এদের চারটি ভেদ, কাষ্ঠাসজ্ঘ, মূলসজ্ঘ, মাথুরসজ্ঘ এবং গোপ্যসজ্ঘ। এদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন স্ত্রীলোকের মুক্তি সম্ভব, অন্যেরা বলেন তা সম্ভব নয়। আচার, গুরু এবং দেবতা বিষয়ে শ্বেতাম্বরদের সঙ্গে এদের পার্থক্য নেই।

জৈনমতে দেবতা হলেন জিনেন্দ্র। তিনি রাগ ও দ্বেষ থেকে মুক্ত। মোহরূপ মহাযোদ্ধাকে তিনি পরাস্ত করেছেন। তিনি কেবলজ্ঞান ও কেবলদর্শনের অধিকারী, সুরশ্রেষ্ঠ ও অসুরশ্রেষ্ঠদের দ্বারা পূজিত এবং যথাযথ বস্তুতত্ত্বের উপদেষ্টা। সমগ্র কর্মফল ক্ষয় করে তিনি পরম পদ লাভ করেছেন।

এককথায় যা'র সমস্ত বস্তুর বিশেষধর্ম ও সামান্যধর্মের সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে, সর্বজ্ঞ। জিনেন্দ্রই একমাত্র সমস্ত কর্মবীজ দগ্ধ করে পরম পদ লাভ করেছেন। অন্যেরা কেউ পারেনি। বিচার করলে দেখা যায় প্রকৃতিপক্ষে তত্ত্ব দুইটি - জীব ও অজীব। কিন্তু কেবল জীব ও অজীব জানলেই সব জানা হয় না এবং ঐ দুটির জ্ঞান হলেই মুক্তি হয় না। মুক্তির জন্য আরো কিছু তত্ত্বকে জানা প্রয়োজন।

তাই হরিভদ্রসূরি বলেছেন –

"জীবাজীবৌ তথা পুণ্যং পাপমাস্রবসংবরৌ।
বন্ধশ্চ নির্জরামোক্ষৌ নব তত্ত্বানি তন্মতে।।"[৪]

অর্থাৎ জৈনমতে তত্ত্ব নয়টি— জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সংবর, বন্ধ, নির্জরা ও মোক্ষ।

জীব চেতন এবং অজীব অচেতন বা জড়। অজীব আবার পাঁচপ্রকার - ধর্ম, অধর্ম, আকাশ, কাল ও পুদ্গাল। জগতের সমস্ত পদার্থই এই দুই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ।

নব-তত্ত্ব:

১। জীব: 'তত্র জ্ঞানাদিধর্মেভ্যো ভিন্নাভিন্নো বিবৃত্তিমান্। শুভাশুভকর্মকর্তা ভোক্তা কর্মফলস্য চ। চৈতন্যলক্ষণো জীবো।।'[৫] জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম থেকে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়, বিবৃত্তিবিশিষ্ট, শুভ ও অশুভ কর্মের কর্তা, কর্মফলের ভোক্তা এবং চৈতন্যস্বরূপ হল জীব।

মণিভদ্রর মতে 'জ্ঞানাদি' ধর্ম বলতে জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্র এই তিনটিকে বুঝতে হবে।

গুণরত্নের মতে 'জ্ঞানাদি' শব্দের দ্বারা বুঝতে হবে জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র, সুখ, দুঃখ, বীর্য, ভব্যত্ব, অভব্যত্ব, প্রমেয়ত্ব, দ্রব্যত্ব, প্রাণধারিত্ব, ক্রোধাদিপরিণতত্ব, সংসারিত্ব ইত্যাদি।

'বিবৃত্তি' শব্দের অর্থ বিভিন্ন প্রকারে বৃত্তি বা বিদ্যমানতা। জীব বা আত্মা বিভিন্ন জন্মে সুর, নর, তির্যক্ ইত্যাদি বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করে। জৈনমতে এই হল আত্মার বিবৃত্তি বা পরিণাম। গুণরত্ন বলেছেন,

এই বিশেষণের দ্বারা প্রথমতঃ চার্বাকদের মত নিরাস করা হয়েছে, তাঁরা জন্মান্তরগামী আত্মা স্বীকার করে না এবং দ্বিতীয়তঃ নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতও অস্বীকার করা হয়েছে, কারণ এরা কূটস্থ নিত্য আত্মা স্বীকার করেন। এই আত্মাই শুভ ও অশুভ সকল প্রকার কর্মের কর্তা এবং কর্মফলের সাক্ষাৎ ভোক্তা। এর দ্বারা সাংখ্যমতের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সাংখ্যমতে পুরুষ বা আত্মা বস্তুতঃ কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়। পুরুষকে গৌণ অর্থেই কর্তা বা ভোক্তা বলে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু জৈনরা বলেন, আত্মা ভিন্ন অন্য কেউ কর্তা হতে পারে না। যে কর্তা হয়, কর্ম করে, সে-ই ফলও ভোগ করে। সুতরাং আত্মাকে অকর্তা বা অভোক্তা বলা সঙ্গত নয়। সাধারণভাবে বলা যায় জৈনমতেও জীব বা আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। প্রথমতঃ মুক্ত ও বদ্ধ ভেদে জীব দু'প্রকার। যে সকল জীব জন্ম হতে জন্মান্তরে সঞ্চরণ করে, তারা বদ্ধ বা সংসারী জীব। আর যে সকল জীবের পুনর্জন্ম হয় না, কর্মক্ষয় হওয়ায় অলোকাকাশে গমন করে, তারা মুক্ত জীব। বদ্ধ জীবও দু'প্রকার, সমনস্ক ও অমনস্ক। গুণদোষ-বিবেচক বা ভালো-মন্দের ভেদজ্ঞান যাদের আছে, সেই মনুষ্যাদি সমনস্ক জীব। তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিবেকরহিত জীব অমনস্ক জীব। মন থাকায় এদের আকাংক্ষাদি থাকে; কিন্তু ভালো-মন্দবোধ থাকে না। অমনস্ক জীবেরও দুটি শ্রেণী—এস বা জঙ্গম এবং স্থাবর। গমনশক্তিসম্পন্ন অমনস্ক জীব 'ত্রস'। যেমন, শঙ্খ, শুক্তি, কীট-পতঙ্গাদি, দ্বীন্দ্রিয়যুক্ত জীব, পিপীলিকাদি ত্রীন্দ্রিয় জীব, দংশ-মশকাদি চতুরিন্দ্রিয় জীব এবং মনুষ্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয় জীব। যাদের চলন আছে; কিন্তু গমন নাই এমন বনস্পত্যাদি হচ্ছে স্থাবর জীব। জৈনরা দ্রব্যকে অস্তিকায় বলেছে। যার দেশব্যাপ্তি আছে তা অস্তিকায়। এই অস্তিকায় দ্রব্যের দুটি ভাগ - জীব এবং অজীব। আত্মাই জীব, জীবনের সঙ্গে আত্মার নিত্যসম্বন্ধ। তবে অজীব হতে জীবকে পৃথক করার জন্য বলা হয়েছে - জীব হচ্ছে দ্রব্যমধ্যে চৈতন্যলক্ষণ। - 'চৈতন্যলক্ষণো জীবঃ।' জীবভেদে চৈতন্যের স্থিতি ও উৎকর্ষ অপকর্ষভেদ দৃষ্ট হলেও চেতনারহিত জীব হয় না। চেতনা জীবের স্বরূপ-স্বাভাবিক এবং অনপায়ী ধর্ম। জৈনমতে জীব 'an eternal spiritual substance.' জৈনমতে জীব বা আত্মা অশরীরী এবং অমূর্ত। দেহ এবং ইন্দ্রিয় হতে জীব পৃথক্; কিন্তু দেহের সঙ্গে সমব্যাপ্ত অতএব 'স্বদেহপরিমাণ'-হস্তীর দেহে হস্তিপরিমাণ, পিঁপড়ের দেহে পিঁপড়ের পরিমাণ। অমূর্ত হলেও তার সঙ্কোচ-প্রসারণ আছে। দীপ যেমন ক্ষুদ্র গৃহে স্থাপিত হলে সে ঐ গৃহকে ব্যাপ্ত করে, প্রশস্ত গৃহে স্থাপিত হলে তাকেই ব্যাপ্ত করে, আত্মাও সেরূপ ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র, বৃহৎ দেহে বৃহৎ হয়ে অবস্থান করে। অর্থাৎ সমগ্র দেহকে আলোকিত ও চেতনাযুক্ত করে দেহের আকার প্রাপ্ত হয়। এই দৃষ্টিতেই আত্মাকে অস্তিকায় বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই বাহ্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঘটে, তখন সে জ্ঞাতা হয়। জৈনমতে জীব জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্তা। সে শুভাশুভ কর্ম করে, কর্ম অনুসারে সুখ ও দুঃখরূপ ফলভোগ করে। কর্মে সে স্বাধীন। শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান তার ইচ্ছাধীন, ফলতঃ সে নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে, সে নিজেই নিজের প্রভু। কর্মপুদগল প্রবিষ্ট হলে জীব বদ্ধ হয়, কর্মপুদগল হতে বিযুক্ত হলে সে মুক্ত হয়। মুক্ত আত্মার উর্দ্ধগতি হয় এবং লোকাকাশের সীমাকে প্রাপ্ত হয়। চৈতন্যলক্ষণ হওয়ার জীব নিত্য, কেননা চৈতন্যের উদয়-ব্যয় নাই। স্বরূপতঃ নিত্য হয়েও দেহধারী হলে সে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। জৈন স্থূলদেহের অতিরিক্ত কর্মজন্য একটি সূক্ষ্মদেহ-ও স্বীকার করেছে। সেই দেহ নিয়েই তার সংসরণ হয়। এই কর্মদেহের ক্ষয়ে জীব মুক্ত হয়, তখন তার কর্তৃত্বও থাকে না। মুক্ত জীবকে সে ভব্য জীব বলে। বদ্ধ জীব অভব্য জীব। জৈন শরীরী জীবের স্থাবর ও এস এবং এই দু'য়েরও অনেক প্রকার ভাগ করেছে। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু সর্বত্রই আত্মা আছে। বৃক্ষাদি স্থাবর জীবের মানস ক্রিয়া নাই; কিন্তু তারাও চৈতন্যাত্মক। গর্ভস্থ ভ্রূণের ন্যায় তারা অবচেতন অবস্থায় আছে। এদের স্পর্শেন্দ্রিয় আছে। জীবের

শ্রেণীবিন্যাসে জৈন বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছে। তার দৃষ্টিতে সমগ্র লোক জীবে পূর্ণ এবং লোকসকল কখনো জীবশূন্য হবে না।

২। অজীব: জীব ভিন্ন পদার্থ অজীব পদার্থ। চৈতন্যলক্ষণ জীব অনেক পদার্থকে জানে, প্রত্যক্ষ অনুভব করে, সুখকামনা করে, দুঃখ হতে ভীত হয়, উপকার-অপকার চিন্তা করে, হিতাহিত কর্ম করে এবং কর্মানুসারে ফলভোগ করে। প্রকৃতি হতে ভিন্ন গুণযুক্ত হওয়ায় জীব (জীবাত্মা) নিত্য। জীব ভোক্তা, অজীব ভোগ্য; জীব জ্ঞাতা, অজীব জ্ঞেয়। অচেতনতাই অজীবের লক্ষণ। চেতনলক্ষণ জীব, অচেতনলক্ষণ অজীব।
হরিভদ্র মহাশয় বলেছেন-
'...যশ্চৈতদ্ বৈপরীত্যবান। অহীবঃ স সমাখ্যাতঃ।'[৬] অজীব আলোচনার পূর্বে জীবের আলোচনা হয়েছে। যে জীব-এর বিপরীত তাকে বলা হয়েছে অজীব। নয়টি তত্ত্বের মধ্যে দ্বিতীয়টি হল অজীব। এই অজীব পাঁচ প্রকার ধর্ম, অধর্ম, আকাশ, কাল ও পুদ্গল।

ধর্ম-অধর্ম: জৈনমতে ধর্ম-অধর্মের অর্থ পুণ্য-পাপ নয়, ধর্ম হচ্ছে দ্রব্যবিশেষের সংজ্ঞা বা জীব তথা পুদ্গলের গতিশীলতার সহকারিকারণ। গতির কারণ ধর্মদ্রব্য এবং স্থিতির কারণ অধর্মদ্রব্য। ধর্মের কোন রূপ-রসাদি নাই। সে সাক্ষাৎ গতি জন্মায় না, কিন্তু গতির সহায়ক হয়; যেমন জল স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থেকেও মীনের গতির সহায়ক হয়। ধর্মবৎ অধর্মও অমূর্ত্ত নির্গুণ, অভৌতিক এবং স্থিরতার উদাসীন হেতু। সাংখ্যের তমোগুণের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য আছে। বিশ্বরচনায় গতিমান্ এবং স্থির পদার্থের আড়ালে অধর্ম নীরবে এক মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুর ছিন্ন-ভিন্ন অংশসকলকে জোড়ার ক্ষেত্রে অধর্ম সহায় হয়। পঞ্চাস্তিকায়সময়সার অনুসারে পাপ-পুণ্যের সঙ্গে জৈনের ধর্ম-অধর্মের কোন সম্বন্ধ নাই; উহারা গতি ও স্থিরতার নিয়ন্ত্রক দ্রব্যবিশেষ। যেমন ছায়া পথিককে থামায় না, তাকে চালায়ও না; কিন্তু শ্রান্ত পথিকের ক্ষণিক বিশ্রামের সহায়ক হয় সেরূপই জীব ও পুদলের ক্ষণিক স্থিতিতে অধর্ম একভাবে সহায় হয়।

আকাশ: আকাশ নিত্য, সর্বব্যাপী, দ্রব্যপদার্থ। সে সকল দ্রব্যকে আপনাতে ধারণ করে। জৈনমতে আকাশের দুটি বিভাগ – লোকাকাশ এবং অলোকাকাশ। বস্তুশূন্য আকাশ অলোকাকাশ। সর্বব্যাপী আকাশের মধ্যভাগে এই অলোকাকাশ অবস্থিত। লোকাকাশ সকল বিশ্বের জীব পুদগল,ধর্ম, অধর্ম এবং কালেরও আশ্রয়। সমস্ত লোকাকাশেই বিশ্বের বিস্তৃতি। তাই লোকাকাশ এক দৃষ্টিতে জগৎ হতে অভিন্ন, অন্য দৃষ্টিতে জগতের অবকাশ-দাতারূপে তদ্ভিন্ন। লোকাকাশকে ছাড়িয়ে আছে অলোকাকাশ। এই আকাশ শুদ্ধ ; ধর্ম-অধর্ম, দ্রব্য, আত্মা এমন কি কালেরও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। অনন্ত, অমূর্ত্ত, ক্রিয়াহীন ও দ্রব্যবর্জিত এই আলোকাকাশ একমাত্র সর্বজ্ঞের দৃষ্টিগোচর।

কাল: সকল সাংসারিক বস্তুই পরিণামশীল এবং জৈনদর্শনে কাল দ্রব্যকে উক্ত পরিণামের প্রতি সাধারণ কারণ স্বীকার কর আহয়েছে। অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ নিয়ে কাল গঠিত। এরা মিশ্রিত হয় না। কালের প্রত্যক্ষ হয় না, কাল অনুমেয়। কাল ছাড়া বস্তুর গুণের স্থিতি – পরিণাম- ক্রিয়াদি সম্ভব হয় না। কাঁচা ফল পাকে, কাঁচার পরবর্তী অবস্থা পাকা। এই পরের ঘটনার ব্যাখ্যা কালের সত্তার উপর নির্ভরশীল। এরূপ গতি, নতুন-পুরোনো, পূর্ববর্তী-পরবর্তী – এই সকল ধারণাও কালকে স্বীকার না করে সম্ভব নয়। কাল একমুখী, ফলে ফিরে আসে না। তাঁর অস্তিত্ব আছে ; কিন্তু কায়ত্ব (পরিমাণ, বিস্তার) নাই। কাল দু'প্রকার – নিত্যকাল ও সাপেক্ষকাল। নিত্য কাল 'কাল' নামে এবং সাপেক্ষ কাল 'সময়' নামে পরিচিত।

পুদ্গল: যার স্পর্শ, গন্ধ ও রূপ আছে, তা অজীবপদার্থ পুদ্গল । পুদ্গল অণুরূপে থাকে, স্কন্ধ রূপেও থাকে। পুদগল বিশ্বের ভৌতিক আধার। পুদ্গলের পারস্পরিক সহযোগিতা হতেই ভৌতিক পদার্থের জন্ম হয়।

৩।পুণ্য: তৃতীয় তত্ত্বের নাম পুণ্য। 'পুন্যং সৎকর্মপুদ্গলাঃ'।[৭]
শুভকর্মের যে পুদগল তা'ই হল পুণ্য। গুণরত্ন বলেছেন : 'পুণ্যং সন্তঃ তীর্থকরত্বস্বর্গাদিফলনির্বর্তকত্বাৎ প্রশস্তাঃ কর্মণাং পুদগলা জীবসম্বন্ধাঃ কর্মবর্গণাঃ'।

৪।পাপ : 'পাপং তদ্বিপরীতং'[৮] অর্থাৎ চতুর্থ তত্ত্ব পাপ হল পুণ্যের বিপরীত। সকলেই সুখ ও দুঃখ বিবিক্তরূপে, পৃথক পৃথক ভাবে উপলব্ধি করে। অতএব তাদের কারণস্বরূপ পুণ্য ও পাপ স্বতন্ত্ররূপেই সিদ্ধ হয়। সেইজন্য পুন্য ও পাপকে পৃথকভাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

৫। আশ্রব: '...মিথ্যাত্বাদ্যাস্তু হেতবঃ। যে বন্ধস্য স বিজ্ঞেয় আস্রবো জিনশাসনে।'[৯] অর্থাৎ মিথ্যাত্ব প্রভৃতি যেগুলি বন্ধনের কারণ হয় সেগুলিকে জৈনশাস্ত্রে আস্রব বলে বুঝতে হবে। মিথ্যাত্ব প্রভৃতি হল – মিথ্যাত্ব, অবিরতি, প্রমাদ, কষায় এবং যোগ। আস্রব হচ্ছে আত্মার কর্মপ্রবেশের দ্বার, যেমন নালীমুখ ক্ষেত্রাদিতে জল প্রবেশের দ্বার বা মার্গ । আস্রব দুই প্রকার – ভাবাস্রব ও কর্মাস্রব।

৬। সংরব: 'সংবরস্তন্নিরোধঃ'[১০] অর্থাৎ ষষ্ঠ তত্ত্ব সংবর হল আস্রবের নিরোধ। আস্রববৎ সংবরও দ্বিবিধ – ভাবসংবর এবং কর্মসংবর।

৭।বন্ধ: 'বন্ধো জীবস্য কর্মণঃ। অন্যোন্যানুগমাৎ কর্মসম্বন্ধো যে দ্বয়োরপি'[১১] অর্থাৎ বন্ধ হল জীবের কর্মে পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ আত্মা ও কর্ম উভয়েরই সমন্ধ। জৈনমতে বন্ধ বা বন্ধন হল আত্মাতে কর্মপুদ্গলের অনুপ্রবেশ। সংসার অবস্থায় কর্মপুদ্গলসমূহ আত্মাতে মিশ্রিত হয়ে যাওয়ায় আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ প্রকাশিত হতে পারে না। বন্ধ দুপ্রকার – ভাববন্ধ ও দ্রব্যবন্ধ।

৮। নির্জরা: 'বদ্ধস্য কর্মনঃ শাটো যস্তু সা নির্জরা মতা"[১২] অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ কর্মের যে ক্ষয় তাকেই নির্জরা বলে। অর্জিত ফলও মুক্তিকামীর কাম্য নয়। এজন্য তাদেরকেও শক্তিহীন বা জীর্ণ করতে হয়। তপস্যাদি কর্মের এই জরণই নির্জরা। এরও দুটি ভেদ – ভাবনির্জরা এবং দ্রব্যনির্জরা।

৯।মোক্ষ: নবম তথা অন্তিম তত্ত্ব মোক্ষ প্রসঙ্গে হরিভদ্রসূরি বলেছেন – 'আত্যন্তিকো বিয়োগস্তু দেহাদের্মোক্ষ উচ্যতে।'[১৩] অর্থাৎ দেহ প্রভৃতির সঙ্গে আত্যন্তিক অসম্বন্ধকে বলা হয় মোক্ষ, কর্মহেতুই আত্মা পুদ্গল কর্তৃক আলিঙ্গিত হয়, বিহিত উপায়ে সেই সংযোগ ছিন্ন হলে আত্মার অনন্তজ্ঞানাদিমান্রূপে যে অবস্থিতি তাই প্রকৃত মোক্ষ।

জৈনমতে উপরিউক্ত নয়টি হল তত্ত্ব। যে ব্যক্তি দৃঢ়চিত্ত হয়ে এদের বিষয়ে যথাযথভাবে মনন করে সে সম্যগ্জ্ঞান ও সম্যগ্দর্শনের সদ্ভাবশতঃ চারিত্র বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করে। সম্যগ্দর্শন, সম্যগ্জ্ঞান ও সমকচারিত্র এই তিনতি মিলিতভাবে মোক্ষের উপায়।

অর্হত্ প্রতিপাদিত তত্ত্বে প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করা হল সম্যগ্দর্শন। জীব প্রভৃতি পদার্থসমূহের প্রকৃত স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করা হল সম্যগজ্ঞান। সকল প্রকার নিন্দনীয় ও পাপজনক কর্ম পরিত্যাগ করার নাম সম্যক্চারিত্র। জৈনসম্মত তত্ত্ব মনন করলে চারিত্র আচরণের অধিকারী হওয়া যায় । "সম্যগ্দর্শনাদি

ত্রিতয়ের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় এবং মোক্ষ অবশ্যই অর্জনীয় ” এই দৃঢ় সংকল্প যার হয়েছে তার ভব্যত্ব পরিপাক হয়েছে বলা যায়। এর ফলে ব্যক্তিবিশেষ যথাযথভাবে উক্ত ত্রিতয়ের অধিকারী হলে শেষ পর্যন্ত মোক্ষ লাভ করে।

মুক্তি সহজলভ্য নয়। মুক্তির পথ অতি দুর্গম। ভোগবাসনা সম্পূর্ণরূপে জয় করা না গেলে মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির জন্য কয়েকটি অবশ্য পালনীয় বিধি বা ধর্ম অনুসরণ করতে হয়। চিত্তশুদ্ধির পর মোক্ষসাধনায় প্রয়োজন ত্রিরত্ন-‘সম্যক্-দর্শন-জ্ঞান-চারিত্রাণি মোক্ষমার্গ।’ সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র্য হচ্ছে মানব জীবনের তিনটি মহামূল্য রত্নস্বরূপ। এজন্য জৈনদর্শনে এদের ’ত্রিরত্ন’ বলা হয়েছে। সম্যক্ দর্শন হচ্ছে-শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস; সম্যক্ জ্ঞান হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান এবং সম্যক্ চারিত্র্য হচ্ছে-সদাচার। এই তিনটির কোনো একটির অভাব ঘটলে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রথম প্রয়োজন সম্যক্ দর্শন- সিদ্ধপুরুষ তীর্থঙ্করদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস প্রদর্শন। তীর্থঙ্করদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং তাঁদের উপদেশের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস না থাকলে মুক্তি-সাধনা সার্থক হতে পারে না। তীর্থঙ্করগণ সিদ্ধ-পুরুষ এবং মুক্তির পথ-পদর্শক-এমন বিশ্বাস মুক্তিকামীর থাকা আবশ্যক। অবশ্য, জৈনরা এ কথাও বলেন যে, বিশ্বাসকে হতে হবে সবিচার, বিচার-বিশ্লেষণমূলক। তীর্থঙ্করের প্রতি অন্ধবিশ্বাস বাঞ্ছনীয় নয়। অন্ধবিশ্বাসপ্রসূত শ্রদ্ধা ও ভক্তি বদ্ধমূল হতে পারে না। বিচারশীল মনোভাবের দ্বারাই তীর্থঙ্করদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি বদ্ধমূল হয়। স্পষ্টতই, জৈনগণ নির্বিচারবাদী নন। সম্যক্ দর্শনের পর প্রয়োজন সম্যকজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বসম্পর্কে সঠিক জ্ঞান- আত্মা, পুদ্গল, অণুসংঘাত ইত্যাদি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান। বিষয়জ্ঞান সম্যক্ না হলে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তত্ত্বজ্ঞানে জীবের অজ্ঞানপ্রসূত মোহমুক্তি হয় এবং তখন জীব মোক্ষসাধনায় অনুপ্রাণিত হয়। তবে, কেবল বিশ্বাস (সম্যক্ দর্শন) ও জ্ঞান (সম্যক্ জ্ঞান) থাকলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না-বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে কর্মের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে জীবনকে পরিচালিত করাই হচ্ছে সম্যক্ চারিত্র্য বা সদাচার। অহিতকর কর্মানুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা এবং হিতকর কর্মানুষ্ঠানে যুক্ত হওয়াই হচ্ছে সদাচার। সম্যকচারিত্র্য লাভের জন্য জৈনরা পঞ্চমহাব্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। পঞ্চমহাব্রত হল-অহিংসা,সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

অহিংসা: পঞ্চমহাব্রতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হচ্ছে অহিংসা। অন্য চারটি ব্রত অহিংসা ব্রতেরই অঙ্গস্বরূপ। কায়, মন ও বাক্যে কোনো জীবের ক্ষতি না করা, ক্ষতির চিন্তা না করাই অহিংসা। হিংসা করা, অন্যকে দিয়ে হিংসা করানো, অপরের হিংসাত্মক কর্ম সমর্থন করা-এসবই ‘হিংসার’ অন্তর্গত। নিজে হিংসা করা যেমন দোষের, অপরকে হিংসায় প্ররোচিত করাও তেমনি দোষের, তেমনি আবার অপরের হিংসাত্মক কর্মকে সমর্থন করা সমান দোষে দুষ্ট। পরিপূর্ণভাবে অহিংসাব্রত উদ্যাপন করতে হলে এজাতীয় চিন্তা ও কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। আবার অহিংসার কেবল না-মূলক দিকই নেই, হ্যাঁ-মূলক দিকও আছে। কেবল ক্ষতি না-করাই অহিংসা নয়, সর্বজীবে প্রেম-বিতরণ ও হিতকর কর্মানুষ্ঠানও অহিংসার অন্তর্গত। সর্বজীবে প্রেম ও ভালবাসা বিতরণের মাধ্যমে এবং কল্যাণকর্মসাধনের মাধ্যমে জীবের আত্মিকবিকাশ পূর্ণতালাভ করতে পারে।

সত্য: জৈন মতে, সত্য হচ্ছে সুনৃত। ‘সুনৃত’ বলতে বোঝায় ‘উপাদেয় ও উপকারী’। যা উপাদেয় ও উপকারী তাই সত্য। মিথ্যা কথন থেকে বিরত থাকলেই সত্যব্রত পালন হয় না। মিথ্যাকে পরিহার করে সত্যকথন, হিতকথন ও প্রিয়কথনই হচ্ছে সত্যব্রত। আবার শুধু বাক্যে নয়, চিন্তা ও কর্মেও সত্যব্রত গ্রহণ

করতে হয়। হিতকর প্রিয় চিন্তা, বাক্য ও কর্মে যুক্ত থাকাই হচ্ছে সত্যব্রত পালন। সত্যব্রত পালনের জন্য সাধককে নিন্দাসূচক, অহিতকর ও অপ্রিয় চিন্তা, বাক্য ও কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকতে হয়।

অস্তেয়: ছলে, বলে বা কৌশলে অপরের সম্পদ গ্রহণ বা অধিকার করা হচ্ছে 'স্তেয়'। চাতুরী বা বলপূর্বক অপরের সম্পদ গ্রহণ বা অধিকার না-করা হচ্ছে 'অস্তেয়'। 'অস্তেয়' বলতে সাধারণত বোঝায় 'অচৌর্য' বা 'অপরের সম্পদ চুরি না করা'। জৈনরা 'অস্তেয়' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এখানে 'অস্তেয়' শব্দটির অর্থ হল- সানন্দ-দান ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থায় অপরের সম্পদ গ্রহণ না করা। কোনো পণ্য ব্যবসায়ী যদি কম মাপের ওজন ব্যবহার করে ক্রেতাকে প্রতারিত করে, তাহলেও সে পরোক্ষভাবে অপরের সম্পদ না বলে গ্রহণ করে এবং অস্তেয়ব্রতকে অমান্য করে।

ব্রহ্মচর্য: কাম-দমন ব্রতই ব্রহ্মক্ষ্মচর্য। 'ব্রহ্মচর্য' বলতে সাধারণত বোঝায় 'জননেন্দ্রিয়কে সংযত রাখা'। জৈনগণ ব্রহ্মচর্য কথাটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। কায়িক, বাচিক ও মানসিক- সর্ববিধ যৌন ব্যাপারে কঠোর সংযমই ব্রহ্মচর্য। অর্থাৎ কায়মনোবাক্য কাম-দমনই ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মক্ষ্মচর্যব্রত পালনের জন্য সাধককে অন্তরে-বাইরে, দেহে-মনে পরিপূর্ণভাবে সংযত হতে হবে।

অপরিগ্রহ: বিষয়-আসক্তি থেকে সর্বতোভাবে মুক্তিলাভই 'অপরিগ্রহ'। পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় হওয়ায়, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দযুক্ত বাহ্যজগৎ সর্বদা আমাদের আকৃষ্ট করে এবং তার ফলে বিষয়াসক্তি দেখা দেয়। মুক্তিকামীর বিষয়াসক্তি মুক্তি পথের প্রতিবন্ধক। এজন্যই অপরিগ্রহ ব্রত পালনীয়। অপরিগ্রহ ব্রত উদযাপন করলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং মুক্তিকামীর বিষয়াসক্তিও দুরীভূত হয়।

এভাবে, সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র্যের সুসমঞ্জস অনুশীলনের দ্বারা জীব তার সঞ্চিত ও সঞ্চয়মান কর্ম-পুদগলবন্ধন ছিন্ন করে স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। পুদগল-বন্ধন ছিন্ন করার সাধনাই হচ্ছে মোক্ষ-সাধনা এবং পুদ্গালবন্ধন মোচনই মুক্তি।

জৈন মতে প্রমাণ দুটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। পরোক্ষ জ্ঞান আবার পাঁচ প্রকার, যথা - স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞান, তর্ক, অনুমান এবং আগম। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও বিষয় উভয়েই সাক্ষাৎ প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরোক্ষের ক্ষেত্রে জ্ঞান সাক্ষাৎ প্রকাশিত হলেও বিষয় ভাসমান হয় অসাক্ষাৎ।

প্রমান আলোচনার পর হরিভদ্রসূরি মহাশয় 'সৎ' বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যাহা উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতি যুক্ত তাহাই 'সৎ' বলে স্বীকৃত।

গ্রন্থকারের মতে জৈনদর্শন শ্রেষ্ঠ। কারণ এর কোনো অংশে পরস্পর বিরোধ নেই। এর সমস্ত বক্তব্য নির্দোষ।

আলোচ্য গবেষণাপত্রের মাধ্যমে জৈন দর্শনের মূল তত্ত্বগুলির বিচার - বিশ্লেষণাত্মক দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে জৈন দর্শনে বিচার-বিতর্কের বিশেষ অবকাশ আছে, এখানে বিশ্বাসের ভূমিকা গৌণ।

তথ্যসূত্রঃ

1) *ষড্‌দর্শনসমুচ্চয়*, কারিকা – ১
2) তদেব – ২
3) তদেব – ৪৪
4) তদেব – ৪৭
5) তদেব – ৪৮ ও ৪৯
6) তদেব – ৪৯
7) তত্রৈব
8) তদেব – ৫০
9) তত্রৈব
10) তদেব – ৫১
11) তত্রৈব
12) তদেব - ৫২
13) তত্রৈব

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি:

1) পাল, বিপদ্‌ভঞ্জন, *ভারতীয় দর্শন*, কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,২০১৪(প্রথম প্রকাশ)।
2) ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। *ভারতীয় দর্শন,* কলকাতাঃ বুক সিন্ডিকেট, ২০২০ (পুনর্মুদ্রণ)।
3) সায়ন-মাধব, *সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ,* সম্পা. সত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী, কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ২০১৯
4) হরিভদ্রসূরি, *ষড্‌দর্শনসমুচ্চয়,* সম্পা. কামেশ্বরনাথ মিশ্র। বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৭৯
5) __________, ___________, সম্পা. মহেন্দ্রকুমার জৈন, নিউ দিল্লীঃ ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, ১৯৯৭ (চতুর্থ সংস্করণ)
6) __________, _____________, সম্পা: শর্বাণী গাঙ্গুলী, কলকাতাঃ সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১০ (প্রথম প্রকাশ)